মূর্তি ভাঙার অভিযান

মূর্তি ভাঙার আন্দোলন শুরু হল ১৯৭০ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে। দক্ষিণ কলকাতায় এক প্রান্তে এর সূচনা। তারপর অত্যন্ত দ্রুত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারের কিছু শহরে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। এর ঢেউ পাঞ্জাবেও পৌঁছেছিল।

এই আন্দোলন যুব-ছাত্ররাই শুরু করেছিলেন এবং তাঁরাই পরিচালনা করেছিলেন। এর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন সি. পি. আই. (এম-এল) নেতৃত্ব এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্বকে তুলে ধরেছিলেন। প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, গ্রামাঞ্চলে যখন কৃষকের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ শাসিত সমাজের ভিতকে জীর্ণ করছে তখন তার প্রভাবে জেগে উঠে এই সমাজের উপরি-কাঠামোকে যুব-ছাত্ররা সঠিকভাবেই আঘাত করছেন।

এই অভিযানের প্রথম লক্ষ্যবস্তু ছিল গান্ধী। তারপর জওহরলাল প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা। ক্রমশ 'বাংলার নবজাগরণ' নামে কথিত আন্দোলন ও তার নায়কদের বিরুদ্ধেও এই অভিযান পরিচালিত হয়।

এইসব ব্যক্তিদের মূর্তি শ্রেণীসংগ্রাম-নিরপেক্ষ নয়। মূর্তির সঙ্গে ছড়িয়ে আছে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর রাজনীতি। প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীরা তাদের প্রশ্রয়পুষ্ট ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের সহযোগিতায়, শিক্ষাব্যবস্থা ও বিরাট বিপুল প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে নানা মিথ্যার উপকরণ দিয়ে গান্ধী ও জওহরলালের মূর্তি রচনা করেছে এবং সর্বত্র সেই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছে। উদ্দেশ্য, গান্ধী-জওহরলালের মূর্তির মাধ্যমে তাঁদের রাজনীতি জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করে থাকুক। তাই মূর্তি-প্রতিষ্ঠা ও মূর্তিভাঙার লড়াই দুই রাজনীতির লড়াই—প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির সঙ্গে বিপ্লবী রাজনীতির সংগ্রাম।

কী ছিল গান্ধী-জওহরলালের রাজনীতি? এই রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদ চায়নি, চেয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শ্রেণীদের শাসন। এই রাজনীতি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মেকি সংগ্রামের আওয়াজ তুলেছে কিন্তু জনগণকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়নি। তার পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদের ও তার দেশীয় অনুচরদের শাসন ও শোষণকে দৃঢ় করেছে, জনগণের সংগ্রামকে বারবার ব্যর্থ করে দিয়েছে। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির অভাবের জন্যই তাঁদের বিভিন্ন কৌশল সফল হয়েছে। তাঁদের মূর্তিভাঙা ছাড়া অর্থাৎ তাঁদের রাজনীতির স্বরূপ স্পষ্ট করে উদ্ঘাটন করা ছাড়া জনগণের মুক্তিসংগ্রাম কোনোদিন জয়ী হবে না।

মূর্তি নিয়ে জালিয়াতি চলে। লেনিন বলেছিলেন, প্রতিক্রিয়াশীলরা বিপ্লবীনেতা ও চিন্তানায়কদের শিক্ষা থেকে তার বিপ্লবী মর্মবস্তুকে মুছে দিয়ে জনসাধারণকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের মূর্তিকে কাজে লাগায়। চতুর সংশোধনবাদীরা সেই কাজই করছে। বামফ্রন্ট কম্প্রাডর-শ্রেষ্ঠ স্যার বদরিদাস গোয়েঙ্কা ও হরিরাম গোয়েঙ্কার পূর্ণ-অবয়ব মূর্তির পাশে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মূর্তি স্থাপন করেছে,

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লেনিনের, গান্ধী-জওহরলালের অনতিদূরে হো-চি-মিনের। জ্যোতি বসুর বহুদিনের সুহৃদ কম্প্রাডর অনাদিলাল পোদ্দারের স্মৃতিকে অমরত্ব দেবার উদ্দেশ্যে অনাদিলাল পোদ্দার সরণি দেখা দিয়েছে, তার অল্প দূরে হো-চি-মিন সরণি। এমনিভাবে চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী চিন্তানায়ক ও নেতাদের সহাবস্থান ঘটিয়েছে। এই সহাবস্থান তাদের রাজনীতির চরিত্রকে তুলে ধরে। যখন তারা গোয়েঙ্কা-বিড়লা-টাটাদের পদতলে আশ্রয় নিয়েছে তখন মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের নাম গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাদের নিজেদের মূর্তি-রক্ষার তাগিদে। এরাই কিছুদিন আগে জব চার্নকের কলকাতায় পদার্পণকে কলকাতার জন্মলগ্ন হিসেবে চিহ্নিত করে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় এই শহরের ৩০০ বছর পূর্তি উৎসব মহা ঘটা করে পালন করেছে। যে বণিকের মানদণ্ড শীঘ্রই এই উপমহাদেশে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল তার আবির্ভাবকে, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সূচনাকে, গৌরবে ভূষিত করতে লজ্জাবোধ করল না। আপাতত আমরা মূর্তি নিয়ে এই জালিয়াতির প্রসঙ্গে যাব না।

১৯৭০-এর সংগ্রাম-মুখর দিনগুলিতে যুব-ছাত্ররা তাঁদের অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তখন দেশে বিপ্লবী-সংগ্রামের সূচনা হয়েছে। নকশালবাড়ীর পর শ্রীকাকুলাম প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছে। ভিয়েতনাম প্রভৃতি নানাদেশে বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আঘাতে-আঘাতে বিপর্যস্ত করছে। চীনের মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতের ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির নতুন মূল্যায়ন করছে। আমাদের দেশের সংগ্রাম এবং চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও অন্যান্য দেশের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রভাবে যুব-ছাত্ররা শুরু করলেন নয়াগণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্প্রতিক অতীতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন। রাজনীতি সংস্কৃতি জগতের নায়কদের বিচারে তাঁদের মাপকাঠি হল—এঁরা কোন পক্ষে ছিলেন: সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে, না পক্ষে? যাঁদের যুব-ছাত্ররা মনে করেছেন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের শিবিরভুক্ত লোক তাঁদের মূর্তি তারা ভেঙেছেন, তাঁদের ছবি তারা ছিঁড়েছেন বা পুড়িয়েছেন—মূর্তিভাঙার উৎসব করেছেন। এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁরা প্রথম ব্যাপক দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যেহেতু মূর্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার প্রশ্ন, বিপ্লবী পথের প্রশ্ন, তাই অনেক মূর্তি অবশ্যই ভাঙতে হবে। ইঁট-কাঠ-পাথরের মূর্তি ভাঙা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে সুকৌশলে ও নানা মোহ দিয়ে ঘিরে যে মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, তাকে ভাঙা, তাকে জনগণের মন থেকে উৎপাটিত করা, অত সহজ নয়। বলপ্রয়োগ করে তা সম্ভব নয়, দ্রুত তা সম্পন্ন হবে না। তার জন্য প্রয়োজন গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, যুক্তি ও আলোচনা, এবং তথ্য ও যুক্তি সমৃদ্ধ নিরন্তর প্রচার। মূল কথা, মিথ্যার রঙিন আবরণকে ছিন্নভিন্ন করে মূর্তিগুলির আসল স্বরূপ নগ্ন করে

দেখানো। তবেই চেতনার মান উন্নীত হতে পারে, বিপ্লবের কাজ দ্রুততর হতে পারে। যে রাজনৈতিক নেতারা মুৎসুদ্দি বড় বুর্জোয়ার স্বার্থে ধর্মের ভিত্তিতে এই উপমহাদেশ এবং বাংলা ও পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করেছে, একাধিক কোটি মানুষকে ছিন্নমূল করেছে, লক্ষ-লক্ষ মানুষকে বীভৎস মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছে, তাদের স্বরূপ যখন উদ্ঘাটিত হবে তখন জনগণ শিউরে উঠবেন ও মূর্তি-গুলোকে মন থেকে উপড়ে ফেলে দেবেন বিনা দ্বিধায়।

গান্ধী-জওহরলালরা শুদ্ধু নয়, 'বাংলার নবজাগরণ' বলে যে গালভরা কথা প্রচলিত হয়েছিল তাকেও যুব-ছাত্রদের অভিযান রূঢ় আঘাত করে গেছে। ব্রিটিশের ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী বন্দর কলকাতায় ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থে শাসকদের পদলেহী দুই শ্রেণীর—নতুন জমিদারশ্রেণী ও মুৎসুদ্দিদের সৃষ্টি হয়েছিল। এই শ্রেণীরা ইংরাজ-দের শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ রূপে গণ্য করত। যাদের স্বার্থ ছিল জনগণের স্বার্থবিরোধী সেই শ্রেণীদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন জনগণের জীবনকে স্পর্শ করেনি, জাগরণ তো দূরের কথা। বিনয় ঘোষের মতো ব্যক্তি যিনি 'বাংলার নবজাগৃতি' নিয়ে তাঁর প্রায় সমগ্র গবেষক জীবন ব্যয় করে গেছেন তিনিও যুব-ছাত্রদের এই অভিযানের প্রেরণায় 'বাংলার নবজাগরণ' আন্দোলনকে শ্রেণীদৃষ্টিতে দেখে নতুন মূল্যায়ন শুরু করেছিলেন।

স্বল্প সময়ের মধ্যে যুব-ছাত্ররা বহু প্রশ্ন তুলেছিলেন, সব প্রশ্নের সমাধান তাঁরা দিতে পারেননি এবং দেওয়া সম্ভবও ছিল না। তাঁদের আন্দোলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে ও আক্রমণের কিছু-কিছু লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে—যেমন ধ্রুবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে—সঙ্গত প্রশ্ন আছে।

কিন্তু রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি সমাজের উপরি-কাঠামোর প্রতি শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ব্যাপারে তাঁদের আন্দোলন shock therapy-র কাজ করে গেছে। তাঁরা সজোরে ঘোষণা করেছিলেন যে, এই ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রাম নিরপেক্ষ নয়; প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীরা যেমন তাকে নিজেদের রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করে তেমনই প্রগতিশীল শ্রেণীদেরও তাকে ব্যবহার করতে হবে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার বিচার করে, পুনর্মূল্যায়ন করে; যা প্রতিক্রিয়াশীল তাকে নির্মমভাবে বর্জন করতে হবে, মিথ্যার আবর্জনা সরিয়ে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে হবে যে সংস্কৃতি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের ও সমাজের অন্য প্রগতিশীল অংশের স্বার্থের অনুকূল হবে, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাহায্য করবে। এতেই মূর্তি ভাঙার অভিযানের স্থায়ী মূল্য।

সুনীতিকুমার ঘোষ